KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7·5" x 6"
Vol. & Number : 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক ১৩২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

প্রাচ্যে শক্তিবাদ।*

—:*:—

জীবনযাত্রার রীতির মত নৈতিক ধারণাও প্রাচ্যদেশে বহুবিধ; তথাপি সাধারণত পাশ্চাত্য জগৎ মনে ভাবে যে, নৈতিক হিসাবে প্রাচ্যের সকল ভাবের ধারা পাশ্চাত্যের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কর্ম্মের আদর্শ লইয়া যখন আলোচনা চলিতে থাকে তখন পরস্পরের পক্ষে পরস্পরকে বুঝিতে পারা কঠিন; কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তাহার চিরাগত সামাজিক প্রথা বদ্ধমূল হইয়া জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং এক জাতি অন্য জাতির প্রথা একেবারে অন্যায় না হউক ঠিক ন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। তাই যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে পরস্পরের নৈতিক ও কর্ম্মের আদর্শ তুলনা করিয়া দেখে, তখন সহানুভূতিতে অন্তর্দৃষ্টির অভাব হইবারই কথা। তথাপি ভারতের সমাজ-নৈতিক চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিতে করিতে সরল, প্রাচীন আর্য্যজগতে গিয়া পৌঁছাইলেই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যে আজ যে সকল গুণের আদর, প্রাচীন ভারতীয়গণও সেই সকল গুণকেই শ্রদ্ধা করিতেন। পাশ্চাত্যে প্রাচ্যসম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা ঠিক নহে, পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যের নৈতিক সাহিত্যও সর্ব্বদা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে

* (Paul Rienski-র Political and Intellectual Currents in the Far East হইতে)।

যে, সত্যানুরাগই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। ভারতের প্রাচীনশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, ধৃতি প্রভৃতি বীরোচিত সদ্‌গুণও অবহেলা করা হয় নাই।

কিন্তু ক্রমাগত বিদেশীর নিকট পরাজিত হইয়া নানারূপ পরিবর্ত্তনে এবং জাতিভেদ প্রথার প্রচলনে ভারতীয় সভ্যতা ক্রমেই যত জটিল হইতে লাগিল, নীতিশাস্ত্রও ততই তাহার প্রাচীন সরলতা হারাইয়া ফেলিল। নীতিশাস্ত্রের নানারূপ বিভাগ হইল, নানারূপ অনাবশ্যক অংশ তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ত্যাগধর্ম্ম (doctrine of renunciation) জাতির মনে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ভারতের পরবর্ত্তী যুগের চিন্তা—সংসারত্যাগ, কর্ম্মবিরতি, জীবনের দুঃখকষ্ট ধীরভাবে সহ্যকরা, এই সব প্রবৃত্তির অনুকূলে। তখন এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ শান্তভাবে সকল শক্তি নিরোধ করিয়া মানুষকে শুদ্ধ ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিল। বারবার বহিঃশত্রুর ভারতজয়, দুর্দ্দম্য জড় প্রকৃতির অত্যাচার, জাতীয়তার অনুভূতির অভাব, এই সকল মিলিয়া চিন্তা জগতের এই সব ভাবকে আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই এই জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে এক মহা সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত দেখিতেছি। নব নব জাতীয় শক্তির উদ্বোধন দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন ভাবে নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে, দেখান হইতেছে যে, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ ও ভগবানের বিধান মাথায় তুলিয়া লওয়া (Submission) হিন্দুধর্ম্মের জটিল শাস্ত্রের একটি অংশমাত্র; দেখান হইতেছে যে পুরুষোচিত গুণ, যে-সব গুণে মানুষকে অধিক কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলে, সে-সব গুণেরও হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া

থাকে। এই সব বীরোচিত গুণ এখন প্রাচ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। জাপানে জাতীয়ভাবের ফল দেখা যাইতেছে, জাপান তাহার জাতীয়-জীবনে যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা এশিয়ার অপরাপর দেশের আদর্শ স্বরূপ।

(২)

হিন্দুদের তুলনায় চীনাদের দার্শনিক আলোচনার প্রবৃত্তি অনেক কম। সহজ বুদ্ধিতে যাহা নীতি-অনুমোদিত মনে হয় তাহাই তাহারা পালন করে। চীনারা চিরকাল শান্তিপ্রবণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তভাবে দাঁড়ানই তাহাদের চরিত্রের প্রধান বল; বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া তাহারা যেরূপ ভাবে নানা অমঙ্গলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহাতে তাহারা ঋষি টল্‌ষ্টয়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, "চীনাকে আদর্শ কর; দেখ এই বিপুল জনসঙ্ঘ কেমন শান্ত ও ধীরভাবে জীবনযাপন করে, বিদ্রোহাচরণ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া শান্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া কেমন ভাবে তাহারা 'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না' Resist not Evil—এই নীতি পালন করে"। চীনা দার্শনিক লাওট্‌জ্ (Lao-Tze) চীনাদের এই জাতীয়-আদর্শ অনেকটা পরিস্ফুট করিয়াছেন। লোকে ইঁহাকে চীনের এপিক্‌টিটাস্ বলে। তিনি reason-কে যেরূপ ভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন তাহাতে গ্রীকদার্শনিকের সঙ্গে তাঁহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহার মতে, reason যেমন ভাবে জগতে ও মানব মনে অভিব্যক্ত, তাহাতে মানবশক্তিকে আত্মপ্রত্যয়বিশিষ্ট

(Self conscious) করার কোনই প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত তিনি, যিনি সহজ ভাব অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহার নিজের reason-এর প্রয়োগ ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিশ্বের reason-কে স্বীয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন। যুক্তি করে সবাই, কিন্তু সবাই আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় না। লাওট্‌জ্‌-এর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা-বর্জ্জনের অর্থ অবশ্য অকর্ম্ম নয়, ইঁহার উপদেশ—সকল বস্তু স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠুক, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে বাড়াইতে যাইও না। কিন্তু জন-সাধারণ তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে তাঁহার প্রচারিত নীতির অন্তরে যাহা ধর্ম্ম ও শক্তির সহায় ছিল তাহা দুর্ব্বলতায় পরিণত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানে অনেক চীনার মতে জাতীয় প্রতিষ্ঠা-নের যে-সব অসম্পূর্ণতার জন্য চীন অসংখ্য অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্য এই লাওট্‌জ্‌-ই দায়ী।

আজ আমরা দেখিতেছি যে এই বিপুল জনসঙ্ঘ জাগিয়া উঠিয়া নিজের অন্তরে নূতন শক্তির পরিচয় লাভ করিতেছে, ইহাদের মন কর্ম্মযোগের প্রতি আরও অনুকূল হইয়া উঠিতেছে; চীনে—আত্ম-প্রতিষ্ঠাবর্জ্জনের দেশ চীনে—সামরিকতা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। শক্তি লাভই যে জাতীয়-আদর্শ তাহা সকল দেশের সাহিত্যে আজ পরিস্ফুট। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য আজ অনেকে ক্ষতিস্বীকারে অগ্রসর, স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলে সামরিক বেশ পরিধান করিয়া সৈন্যদের মত শিক্ষা পাইতে আগ্রহান্বিত। এতদিন দেশে লোকে যুদ্ধবৃত্তি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, আজ সে ঘৃণা নূতন নূতন শক্তির আবির্ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে। চীনা বীর ওয়াং-ইয়াং-মিং এই নূতন ভাবের বন্যা দেশের সাহিত্যে

আনিয়াছেন, তাঁহার রচনার মূল্য যে কত বেশি, তাহা জাপানীরা প্রথমে দেখাইয়া দেয়। আজিকার দিনে তিনি চীনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান লেখক। কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই—চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণাম যদি কর্ম্ম না হয়, তবে সে চিন্তা ও জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা এই হিসাবে পরীক্ষা করিতে হইবে যে তাহা কর্ম্মজীবনের পক্ষে সহায় কি না। নিজে তিনি সংসারী ছিলেন, এবং স্বীয় মত এমন ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, বীরোচিত কর্ম্মে পাঠকের উৎসাহ জন্মে। কর্ম্মের জন্য এই উৎসাহ, বিপ্লববাদের ভাবে এবং পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় অভিব্যক্ত হইতেছে; বৃদ্ধ দার্শনিক বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত এসব পছন্দ করিতেন না। অন্যায় যে সহ্য করিতে হইবে, এ ভাব চীন দেশ হইতে অনেকটা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে এই বিশ্বাস যে, শুধু বীরত্বের দ্বারাই জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সকলের সমাধান করিতে হইবে। ওয়াং-ইয়াং-মিং-এর কথাগুলি চীনের কর্ণে যেন তূর্য্যনিনাদ করিতেছে।

প্রাচ্যে কর্ম্মযজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত জাপান। শুধু তাহার বর্ত্তমান জীবন নয়, তাহার অতীতও এই কর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছে। প্রাচ্যে একমাত্র জাপানেই ইউরোপের মত সামরিক সামন্তশ্রেণী (Military feudalism) গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন তাহার অন্তরে জাতীয়-সত্তার পূর্ণ অনুভূতি জন্মিল তখনও সামন্ত-প্রথার সামরিক দিকটা তাহার কর্ম্ম ও ভাবের কেন্দ্র হইয়া থাকিল। ভারতে ও চীনে পুরোহিত ও পণ্ডিত যেমন গৌরব লাভ করিয়া

আসিয়াছে, জাপানে কখনও তেমন হয় নাই। জাপান, বুদ্ধ ও কনফিউশিয়াস, এই উভয়ের ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার আপন চিন্তার ধারা দিয়া এই দুই ধর্ম্মকে জাতীয় ভাবের সহিত মিশাইয়া লইয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বাদে যে বিরোধ আছে তাহাতে ভয় না পাইয়া জাপান তাহার জাতীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্মনীতি এরূপভাবে গড়িয়া তুলিল যে তাহাতে মানবশক্তির উৎকর্ষ ও অভিব্যক্তি প্রধান স্থান অধিকার করে। সামরিক যুগ হইতে সে তাহার 'বুশিদো' বা ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্লেটো ও হিন্দু দার্শনিকগণ সত্যানুরাগ, মহাপ্রাণতা, সাহস ও অন্যান্য যে-সব গুণ ক্ষত্রিয়োচিত বলিয়া বর্ণনা করেন, এই 'বুশিদো' ধর্ম্ম সেই সকল গুণকেই প্রশ্রয় দেয়। নব্য জাপান, জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই নীতি চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই; স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সামরিক যুগে যে-সব বিধি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে-সকল বর্ত্তমান শ্রমজীবি-সমাজের নৈতিক সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে অপারগ।

(৩)

সমসাময়িক প্রাচ্যচিন্তার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, যে এই সব প্রাচীন জাতি কর্ম্ম ও শক্তির তত্ত্ব কতদূর ভেদ করিতে পারিয়াছে। এই সকল বিষয়ে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের প্রভেদ থাকিবেই, মৌলিক ভেদের জন্য বাহিরের উন্নতির পথও স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে যাহা বুঝায় আজও সে ভাব প্রাচ্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই

মানবের ব্যক্তিত্বের এই যে প্রাধান্য, স্বচ্ছন্দ বিকাশের এই যে অবসর, ইহার মূল খুঁজিতে গেলে গ্রীস রোমের ক্লাসিসিজ্‌মের (Classicism-এর) নিকট যাইতে হইবে। ক্লাসিক আদর্শ আত্মসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত; যাহা শুধু কৌতূহল তৃপ্তি করে, ভয় উৎপাদন করে বা বুদ্ধিভ্রংশ জন্মায় সে-সব ছাড়িয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে ভাব ও ভাষাকে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা—ইহারই নাম ক্লাসিক ভাব। এইরূপে আত্মদমন হইতে স্বাধীনতা জন্মে। এই আত্মসঙ্কোচনের ফলে মানুষ পরস্পরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বুঝিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্য মনে হয় যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদী পাশ্চাত্য সকলের প্রতি সমান ভাবে নৈতিক বিধান প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে, নীতির সহিত সমাজতন্ত্র মিশাইয়াছে। কিন্তু 'ব্যক্তিত্ব আত্মসংযমের ফল' একথা মনে রাখিলে এ ব্যাপার তেমন অসম্ভব বোধ হইবে না।

এই সকল ব্যাপারে অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মস্ত বড় ভেদ রহিয়া গিয়াছে। মানবজীবনে কর্ম্মশক্তি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা জানিবা মাত্র প্রাচ্যদেশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যেসব কর্ত্তব্য বিহিত আছে তাহাদের দোহাই দিতে চায়। প্রাচ্যের বর্ত্তমান যুগে প্রধান সমস্যা—শক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছাড়িয়া মানবসাধারণের জন্য বিহিত নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করিলে কি তাহা লাভ করা যাইবে? সমাজধর্ম্মে সাধারণ-তন্ত্র চলিবে, না অভিজাত তন্ত্র?

এশিয়ার প্রধান দেশ তিনটির মধ্যে চীনই গণতন্ত্রের দেশ; যখন পৃথিবীতে অপর কোনও দেশ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী বলিয়া স্বীকার করে নাই, তখন চীনের অবস্থা এরূপ ছিল যে সমগ্র

সমাজের পক্ষে Community সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে সর্ব্ব-সাধারণের সম্মতির আবশ্যক হইত। বর্ত্তমান জাতীয় পরিবর্ত্তনে এই প্রজাতন্ত্রের ভাব আরও পরিস্ফুট, রাষ্ট্র এখন সাধারণের মতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। জাপানে যে একটা নামমাত্র পার্লামেণ্ট প্রচলিত আছে তাহা ছাড়াইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন শাসনপ্রণালী দেওয়া হইবে যাহাতে ইহার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই লোকায়ত্ত হইতে পায়।

সমাজধর্ম্মে বহুর প্রাধান্য থাকিবে, না কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বরেণ্য করিয়া রাখা হইবে এই সমস্যার মীমাংসা দূর-প্রাচ্যে কিরূপ ভাবে সমাধান হয় তাহা দ্রষ্টব্য বটে। ভারতে ও জাপানে সমস্যা দাঁড়াইতেছে এই—জাতীয় জীবনে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রাচীন পন্থা অবলম্বন না করিয়া অন্য কি উপায়ে সেই শক্তির বিকাশ সাধন করা যাইতে পারে? আর যদিই বা এই প্রাচীন ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে তবে এমন কোনও উপায় আছে কি যাহাতে ইহার প্রভুধর্ম্ম (master morality) সর্ব্বসাধারণের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। আর চীনের সমস্যা—যে স্বল্পসংখ্যকের নেতৃত্ব জাপানে এতদূর বিকাশিত যাহা ভারতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে, সেই নেতৃত্বের বিকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া জাতীয় জীবনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় কি না? ইহা যে অসম্ভব, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে চীনের সমাজধর্ম্মে গণতন্ত্রের ভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে পারে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে সভ্যতার এই বিকাশ-রঙ্গভূমি এশিয়ায় প্রভুধর্ম্ম ও দাসধর্ম্মের মহা বিরোধের এত শীঘ্র সামঞ্জস্য হইতে চলিল?

এ কথা হয় ত সত্য যে, প্রাচ্যের ভাবুকগণ যখন ইউরোপের সহিত আমাদের সভ্যতা তুলনা করিয়া দেখেন তখন তাঁহারা যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ফলে ব্যক্তিগত শক্তি ফুটিয়া উঠে এদেশে সেই ব্যক্তিত্বের অভাবই বিশেষ করিয়া বোধ করেন। উচ্চ আশায় তাঁহাদের মন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, নবজাগরণের জাতীয় উদ্বোধনের ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের ধারণা, মানবকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ লাভ করিতে ও কর্ম্মে পরিণতি লাভ করিতে হইলে তাহার পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা আবশ্যক। তাই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ান যে অতীতের কোন্ বিধানের বলে সমস্ত জাতির মধ্যে নেতৃত্বের ভাব সঞ্চারিত করা যায় এবং আশা করেন যে এই সব বিধি-বিধান হইতে মানুষের ব্যক্তিত্ব এমন ভাবে ফুটাইতে পারিবেন যে তাহাতে জাতীয়-জীবন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

(৪)

বর্ত্তমান যুগে জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্যের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রকৃতির অত্যাচার সহ্য করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহা দূর হইয়া এখন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বাসনা এশিয়ার মনেও জাগিতেছে। সে দিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য-জীবনে বিশ্বের রহস্যের দিকটাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। প্রাচ্য বুঝিতে তেমন চায় না, যেমন সে কল্পনা করিতে চায়, ব্যাখ্যা করিতে চায়, ডষ্টয়েভস্কি বলিয়াছিলেন, "রাশিয়াকে বুঝিতে পারা যায় না, রাশিয়াকে বিশ্বাস করিতে হইবে।" (Russia cannot be understood, she must be believed in.) এই ভাব লইয়া

প্রাচ্য চারিদিকে যাহা কিছু উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যময় তাহাতেই মুগ্ধ থাকিতে প্রস্তুত। তাহার মতে জীবনের প্রত্যেক ভাব কোন রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশমাত্র! সর্ব্বত্রই ভূতযোনি আছে, দরিদ্রতম হিন্দু কৃষকের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল। চীনাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল ভূতযোনীতে পূর্ণ। গভীর বনে, উপত্যকার মধ্যে, জাপানীরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তাহাতে কখনও প্রবেশ করে না; কিন্তু সে-সব মন্দির বিদেহ বীর-আত্মার ও দেবতার আবাস। যখন স্তব্ধ সন্ধ্যার নীরবতায় প্রকৃতি শব্দহীন তখন অনেকে জালযুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া সম্ভ্রমের সহিত মন্দির মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস প্রাচ্যজাতির, বিশেষত ভারতীয় ও জাপানাদের বীরপূজায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাহারা মহাপুরুষকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে, তাঁহাদের পূজা তাহাদের নিকট অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য যেন চারিদিকে আধ্যাত্মশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং এই আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর ভিতরই তাহার জীবন বাড়িয়া উঠে।

কিন্তু প্রাচ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ধারণা প্রচলিত নাই, ধারণাটি এই যে, রহস্যময়ী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির সকল কর্ম্ম এক নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে চলিতেছে। প্রাচ্য জনসঙ্ঘের মনে এখনও যথেচ্ছাচারী ভূতযোনী রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম এখনও জনসাধারণের মনে ছাপ মারিয়া যায় নাই। জড়জগতের শৃঙ্খলারও এক বিশ্বজনীন নিয়মানুযায়ী সংহতভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের ধারণা সুদূর অতীতে তাহাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রচারিত

হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্যে এ ভাব যেমন বহুজনবিদিত, প্রাচ্যে তেমন নয়।

প্রতি প্রাচ্য মনের এইভাব দুই কারণে জন্মিয়াছে; প্রথমত স্বভাবের শক্তি দেখিয়া মানব-মন ভীত ও সঙ্কুচিত হয়, এই সব শক্তির শাস্তা ও নিয়ন্তারূপে সে আর নিজকে ভাবিতে পারে না, দ্বিতীয়ত প্রাচ্যের দার্শনিক মন (philosophical mind) আত্মা লইয়াই এত ব্যস্ত যে সে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্ত্তবাদ লইয়া এক জটিল শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে বটে কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে (Experimental method) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে শিখে নাই। কিন্তু আমরা যে শক্তিবাদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহাতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতি প্রাচ্যের মনোভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবেই। পাশ্চাত্যে মানববুদ্ধি ও শক্তি যে-বিষয়ে এতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সে-বিষয় প্রাচ্যের অভিজ্ঞতার বাহিরে থাকিবে না। ইহার মধ্যেই জাপানীরা জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে আর ভারতে মহা আন্দোলন চলিয়াছে —সঙ্কীর্ণভাবে প্রাচীনগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রচলিত প্রথা বর্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার এই যে সদ্য জাগ্রত প্রবল বাসনা, ইহার সহিত প্রাচ্যের গভীরতম ভাব মিশান আছে।

(৫)

কিন্তু প্রাচ্যে যদি এই শক্তিবাদ ও কর্ম্মবাদ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাবও সেই সঙ্গে

বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। জাপানীরা যে পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্যে শক্তিলাভ করিয়াছে, তাহা শুধু আপন আদর্শ ও সভ্যতা আরও দক্ষতার সহিত রক্ষা করিবার জন্য। "শক্তি সঞ্চয় কর যেন নিজত্ব বজায় রাখিতে পার" (Make yourself strong so that you may retain the right to be yourself)—শুধু জাপানের নয়, চীন ও ভারতের মনোভাবও ইহাই বলিয়া মনে হয়, বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করা কর্ম্মজগতে শ্রেয় বটে, কিন্তু মানুষের আত্মা, তার মনোজগতের রহস্য, মানবাত্মার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা, এই সব ভাব জড়জগতের যে-কোন ব্যাপার অপেক্ষা তাহাকে অধিক মুগ্ধ করিবে। এই উদার আধ্যাত্মভাব পৃথিবীকে দিবে, সংসারে ইহা চিরস্থায়ী করিবে, ইহাই প্রাচ্যের প্রধান কাজ—প্রাচ্যের নিকট ইহা অতি উৎসাহের ও উদ্দীপনার কথা। প্রাচ্য জানে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—তাহার ব্যষ্টির উন্নতি, কর্ম্মজগতে শক্তিবিকাশ, সরল ও সুন্দর কার্য্যপ্রণালী, জটিল যন্ত্রতন্ত্র, এ সকলের মূল্য প্রাচ্য বোঝে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও ভাল করিয়া জানে যে, মানুষের আত্মা শুধু এইসব উন্নতি, এইসব বাহিরের সিদ্ধি দিয়া সর্ব্বদা অভীষ্ট লাভ করে না, জানে যে যন্ত্রতন্ত্র আত্মাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, কলের চাপে মানুষের চিত্তবৃত্তি একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। যখন সে দেখে অতি গভীর চিন্তারাজ্যেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জড়বাদ ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন সে অনুভব করে যে প্রাচ্যেরও একটা কথা বলিবার আছে এবং সে কথা জগৎ শুনিবে। প্রাচ্য আশা করে, এই জড়বাদ হইতে সংসারকে সে মুক্তি দিবে। ঠিক কোন্ পথে কেমন করিয়া দিবে তাহা এখনও পরিষ্কার বুঝিতে

পারা যায় না; কিন্তু পাশ্চাত্য যেমন তাহার কর্ম্মজগতে প্রাধান্যে গৌরব বোধ করে, প্রাচ্যও তেমনই এই চিন্তা হইতে আশা ও সান্ত্বনা লাভ করে যে তাহার আধ্যাত্মিকতা জগৎকে মুক্তি দিবে। আধ্যাত্মিক জগতে যে-বস্তুর মূল্য আছে সেই বস্তু লাভের জন্য যদি প্রাচ্যে তাহার নবজাগ্রত শক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত।

সাহিত্য বনাম পলিটিক্স।

—:০:—

গত পয়লা জানুয়ারি তারিখে একটি বন্ধুর বাড়ীতে আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুকাল পরে আবার দেখা হয়, তিনি প্রথম কথা যা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে হচ্ছে এই—

"এখন তুমি কি করছ?"

আমি উত্তর করলুম—"বিশেষ কিছুই না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—

"হাঁ আমিও তাই মনে ভেবেছিলুম। কি কংগ্রেস কি কন্‌ফারেন্স, কোন দলেই তোমার নাম দেখতে পাই নে। পলিটিক্সে যোগ দেও না কেন?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একজন প্রবীন মডারেট বলে উঠলেন—

"ওদের কথা ছেড়ে দিন। ও সাহিত্য নিয়েই বসে আছে, যেমন ওর ভাই রয়েছে শিকার নিয়ে"।—এ কথার কোনও জবাব খুঁজে না পেয়ে একটু ভদ্রতার হাসি হাসলুম। কেন না আমার সাহিত্য-চর্চ্চার সঙ্গে আমার অগ্রজের মৃগয়াচর্চ্চার যোগাযোগটা কোথায় এবং কতখানি তা ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। মনে হল যে হয়ত লোকের বিশ্বাস যে আমার ভ্রাতা যেমন জঙ্গলের বাঘ ভাল্লুকের উপর গুলি

চালান আমিও তেমনি মনোজগতের চতুষ্পদদের উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করি। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে ভদ্র-সমাজে বাক্য-সম্বরণ করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই শ্রেয়।

এই ঘটনার দিন দুই তিন পরে আইন ব্যবসায়ীদের একটি আড্ডায় কার্য্যগতিকে উপস্থিত হবামাত্র জনকয়েক যুবক এসে, আমি কেন পলিটিক্সে যোগ দিই নে, সেই বিষয়ে যৌবনসুলভ মুরুব্বিয়ানা সহকারে আমার কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি উত্তর করলুম—"শরীরে যে সব গুণ থাকলে মানুষে পলিটিসিয়ান হতে পারে আমার দেহে সে সব গুণ নেই বলে।"

এ জবাব তাঁদের কাছে অবশ্য গ্রাহ্য হল না। তাঁদের ধারণা যে রক্ত মাংসের শরীরমাত্রই পলিটিসিয়ান হবার পূরো ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। নইলে তাঁরা পলিটিসিয়ান হলেন কি করে? অতএব স্থির হল, পলিটিক্স থেকে আলগা হয়ে থাকায় আমি দেশের প্রতি আমার আসল কর্ত্তব্য অবহেলা করছি। এ অভিযোগের কি প্রতিবাদ কর্‌ব মনে ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একটি নবীন Extremist বলে উঠলেন—

"কেন উনি ত বাঙলা সাহিত্য লিখছেন, সেও ত একটা মন্দ কাজ নয়। Artistic কাজ করবার জন্যও ত দেশে দুচার জন লোক চাই।"

বাঙলা লেখাটা একেবারে অকাজ নাও হতে পারে, এ সন্দেহ যে ইংরাজি বক্তাদেরও আছে এর পরিচয় পেয়ে আমি অবশ্য চমৎকৃত হলুম, বিশেষত যখন শুনলুম যে আমরা যা করি পলিটিসিয়ানদের মতে সেটি হচ্ছে আর্টিষ্টিক কাজ। বুঝলুম যে রাজনীতির বিশ্বকর্ম্মাদের বিশ্বাস, তাঁরা যে মাতৃমূর্ত্তি গড়ে তুলছেন তার সাজের জন্য আমরা আগে

থাকতেই পাঁচ রকম সোনা রূপোর নয়, রাঙতার অলঙ্কার বানিয়ে রাখছি। এ অবস্থায় চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলুম। কিছু বলতে হলে বলতে হত এই কথা যে, তোমরা যদি সত্যসত্যই মায়ের প্রতিমা গড়ে তুলতে কৃতকার্য্য হও তাহলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে আসতে হবে, আর এ যুগে যারা মনের কারবার করে তারাই হচ্ছে যথার্থ ব্রাহ্মণ, বাদবাকী সকলে অন্তত এদেশে, হয় বৈশ্য, নয় শূদ্র। বলা বাহুল্য এ জবাব artistic হত না, অর্থাৎ—শ্রোতাদের কাছে তাদৃশ শ্রুতিমধুর হত না।

(২)

উপরোক্ত দুটি ঘটনাই সম্পূর্ণ সত্য, তিলমাত্র কাল্পনিক নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজকের দিনে দেশের পলিটিক্স সম্বন্ধে কারো পক্ষে উদাসীন হওয়াটা কেউ সঙ্গত মনে করেন না। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ইংরাজি শিক্ষিত লোকের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন করাটা বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে এখন অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে, এবং যিনি রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকেন সমাজের কাছে তাঁর একটা জবাবদিহি আছেই আছে, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি হন একজন সাহিত্যসেবী। কেননা যে একমাত্র বস্তু নিয়ে আমাদের পলিটিক্সের কারবার, অর্থাৎ—বাক্য, সে বস্তু সাহিত্যিকদেরও হাতে আছে এবং পলিটিসিয়ানদের অপেক্ষা বেশি পরিমাণেই আছে। কেননা পলিটিক্সের কাজ গুটিকয়েক মুখস্থ বুলির সাহায্যেই চলে যায় কিন্তু সাহিত্যের কাজের জন্য চাই অনেক মনের কথা। পলিটিক্সের কথার নোট বদলাই করে যে অনেক ক্ষেত্রে সিকি পয়সাও মেলে না, তা ভুক্ত-

ভোগী জাতমাত্রেই জানে, অপর পক্ষে সাহিত্যের কথার পিছনে যে অক্ষয় অর্থ আছে এ সত্যও সভ্য জগতের কাছে অবিদিত নেই।

(৩)

দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার সঙ্গে সকলের স্বার্থ যে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জড়িত সে জ্ঞানটা অবশ্য আমাদেরও আছে, কেন না এ জ্ঞানলাভের জন্য দিব্যদৃষ্টির দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে পলিটিক্সে হাত লাগাবার সবারই যে সমান অধিকার আছে একথা চট্‌করে মানা কঠিন। সে কথা মানতে হলে এ কথাও মানতে হয় যে ও-বিষয়ে বিশেষকরে কারও অধিকার নেই, অর্থাৎ—ও হচ্ছে সমাজের একটা বেওয়ারিস মাল। আসলে কিন্তু ও হচ্ছে সংসারের আর পাঁচ রকম ব্যবসার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবসা, এবং এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীর ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে। তবে যে পলিটিসিয়ানরা যাকে পান তাকেই দলে টানতে চেষ্টা করেন, সে শুধু দল পুরু করবার জন্য। এবং যে যত বেশি অনধিকারী তাকে ধরে যে এঁরা তত বেশি টানাটানি করেন তার কারণ, নেতারা জানেন যে ঐ শ্রেণীর লোক তাঁদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হবে। আর সেই সঙ্গে এও তাঁদের জানা আছে যে এক পক্ষের মেষেরাই অপর পক্ষের উপর বাঘ হয়ে বসে। এ সত্ত্বেও সাহিত্যিকদের এক্ষেত্রে টেনে আনা বৃথা। এ জাতীয় জীবরা পলিটিক্সের সিংহব্যাঘ্র হতে যেমন অক্ষম, গড্ডলিকা হতে তার চাইতেও বেশি অক্ষম। এরা সব একবর্গা লোক।

সে যাই হোক্ এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পলিটিক্সে মেতে যাওয়াটা সাহিত্যিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। ইউরোপের ইতি-

হাসে এর প্রমাণ পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে পরধর্ম্ম গ্রহণ করা যে ভয়াবহ, এ কথা ত আমরা সবাই ভক্তিভরে যখন-তখনই আওড়াই। এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সাহিত্যের ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। যার মন নামক পদার্থ নেই, তারও যে মত থাকতে পারে তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যায়। বরং সত্য কথা বলতে হলে, যে ক্ষেত্রে প্রথমটির যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির তত প্রভাব।

আর এক কথা, এ জাতের লোকের হাতে পড়াটা পলিটিক্সের পক্ষেও ক্ষতিকর। পলিটিক্স কবির হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ভাবমদমত্ত, দার্শনিকের হাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ঔপন্যাসিকের হাতে অদ্ভুত ও ঐতিহাসিকের হাতে ভূতগ্রস্থ। একথা যে সত্য তার প্রমাণের সন্ধানে কি আর বিদেশে যেতে হবে? কিন্তু পলিটিক্সের মোটা কারবার হচ্ছে তেল-নুন-লকড়ি নিয়ে, অতএব এ কারবারে সাহিত্যিক অংশীদার হলে সে কারবার ফেল মারবারই বেশি সম্ভাবনা। এ কারবারে সাহিত্যিক থাকতে পারেন শুধু, ইংরাজিতে যাকে বলে sleeping partner, সেই হিসেবে। এ হিসেবে এ ব্যাপারে তিনি চিরকালই আছেন কেননা ভাবের মূলধন একা তিনিই যোগান, কাজ চালায় শুধু যত শূন্য বক্রাদারে। পরের ভাবের ধনে পোদ্দারী করবার চাতুরী যিনি জানেন তিনিই না শ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান!

উপরে যা সব বললুম সে নিজে সাফাই হবার জন্য নয়, কেননা আমি কবিও নই, দার্শনিকও নই, ঔপন্যাসিকও নই, ঐতিহাসিকও

নই, এক কথায় আমি সাহিত্যিকই নই। আমি লেখক বটে কিন্তু সে হচ্ছে টীকা টিপ্পনির, অর্থাৎ—আমার কলম সর্ব্বঘটেই আছে, সে কলম পলিটিক্সের কালিও বার বার মুখে মেখেছে। জন্মের ভিতর কর্ম্ম আমি একবার মাত্র একটি গল্প লিখেছিলুম, কিন্তু সেটি গল্প নয়, "রাম শ্যামের" জীবনচরিত। অনুগ্রহ করে যিনি সেটি পড়বেন তিনিই দেখতে পাবেন যে তার ভিতর কাব্যরস বিন্দুমাত্রও নেই, আছে শুধু ছাঁকা পলিটিক্স এবং সে পলিটিক্সের ভিতর দার্শনিক তত্ত্বের নাম গন্ধও নেই, আছে শুধু নিরেট সত্য।

অতএব আমি যে কেন পলিটিক্সে যোগদান করি নে তার জন্য সমাজের কাছে আমার জবাবদিহি নিশ্চয়ই আছে। আমার কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে, আমি যোগ দিই নে কেননা দিতে পারি নে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক।—

আজকের দিনে পলিটিক্সে যোগ দেবার অর্থ, হয় মডারেটের, নয় extremist-দের ক্ষুরে মাথা মোড়ানো। আমি যে এ দু দল থেকেই তফাৎ থাকি, তার কারণ এ দু'দলের মতামতের ও কার্য্যকলাপের মধ্যে আমি বিশেষ কোনও প্রভেদ দেখতে পাই নে। এ অবস্থায় কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? দু'দলেই যা করছেন, পলিটিক্সের পরিভাষায় তার নাম constitutional agitation, তবে প্রথম দল ঝোঁক দেন এর প্রথম পদ, অর্থাৎ—বিশেষণের উপর, আর দ্বিতীয় দল ঝোঁক দেন এর দ্বিতীয় পদ, অর্থাৎ—বিশেষ্যের উপর, এই যা তফাৎ। এ ছাড়া আর যা প্রভেদ আছে সে হচ্ছে আসলে প্রকাশের ভাষায় ও ভঙ্গীতে, অর্থাৎ—এ দু'দলের আসল পার্থক্য হচ্ছে রীতিগত, ইংরাজীতে যাকে বলে style, তাই নিয়ে এঁদের যত দলাদলী। যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের

বাক্য প্রধানত করুণ রসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত বীররসাত্মক। এ ত হবারই কথা, কেননা মডারেটরা দেশ উদ্ধারের উপায় বা'র করেছেন বুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremist-রা উপায় স্থির করেছেন বুরোক্রাসিকে গালাগালি করা। পলিটিক্সে এ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে, তবে অস্থানে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করলে এই গলাগলিটে আমার কাছে যেমন দৃষ্টিকটু, এই গালাগালিটেও আমার কাছে তেমনি শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। এই দু'পক্ষের কৃতকার্য্যতার দুটি টাট্‌কা উদাহরণ নেওয়া যাক। মডারেটরা সেদিন টাউনহলে এক সভা করে যে সব বক্তৃতা করেছিলেন তার সুর এমন মিনমিনে যে তা শুনে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা চুরি করে আমার বলতে ইচ্ছে যায় "সাল্‌সা খাও, সালসা খাও"! তারপর extremist দল সেদিন গোলদিঘিতে লর্ড সিংহের পিছনে যে রকম ফেউ লেগেছিলেন তা শুনে আবার দ্বিজেন্দ্রলালেরই কথা চুরি করে দেশের লোককে বলতে ইচ্ছে যায় "ঘটিবাটি সামলা"! আমার মতে আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দেওয়ায় যেমন আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া হয় না, তেমনি আত্মসংযমে জলাঞ্জলি দেওয়ায় আত্মমর্য্যাদার পরিচয় দেওয়া হয় না। তার উপর নাকিকরুণ ও খেঁকি-বীর—এ দু'ই আমার কানে সমান বেসুরো লাগে। রস মাত্রেই ব্যভিচারী হলে বিভৎস হয়ে পড়ে, তা সে ছিঁড়েই যাক আর গেঁজেই উঠুক। জানি যে এ কথায় আমার সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোক সহানুভূতি করবেন না! কিন্তু কি করা যাবে—শাস্ত্রেই বলে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। এ কথা শুনে রাজনৈতিকের দল যদি চটে বলেন যে রাজনীতিতে সুরুচির কোনও স্থান নেই, তাহলে অবশ্য

আমাকে নিরুত্তর থাকতে হবে। রাজনীতিতে সুনীতির যে কোনও স্থান নেই তার প্রমান ত আজকের দিনে মহা মহা দেশের মহা মহা পলিটিসিয়ানরা সকাল-বিকেল দিচ্ছেন, অতএব সুরুচি কোন্ দলিলে সেখানে প্রবেশ লাভ করবে?

মরুক গে সুনীতি আর সুরুচি। রাজনীতির রাজ্য হতে ও-দুটিকে নির্ব্বাসিত করে দিলেও সেই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিকেও যে গলাধাক্কা দিতে হবে এমন কথা বর্ত্তমান ইউরোপীয় পলিটিক্সের আদিগুরু স্বয়ং Machiavelli-ও বলেন না এবং একটু ভেবে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ও-দু'দলের কোন দলে যোগ দেওয়াটা আজ সুবুদ্ধির কার্য্য হবে না। কারণ কালে এ দু'দলের কোন দলই টিকে থাকবে না, সত্য কথা বলতে গেলে, এর একটি দল ত ইতিমধ্যে গত হয়েছে। মডারেট দল ত সেদিন আত্মহত্যা করেছে, সম্ভবত অচিরাৎ সরকারী স্বর্গ লাভ করবার আশায়। আমাদের পরস্পরের ভিতর নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগ সম্বন্ধে ত কোনরূপ মতভেদের অবসর নেই। যার শরীরে মানুষের চামড়া আছে তার গায়েই ত পল্টনি চাবুক কেটে বসেছে। সুতরাং অমৃতসহরের দিকে যাঁরা পিঠ ফিরিয়েছেন পলিটিক্যাল হিসেবে তাঁরা যে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, সে কথা বলাই বেশি।

তারপর রিফরম্ বিল আমাদের পলিটিক্সের বনেদ নতুন করে পত্তন করেছে। এতদিন আমাদের পলিটিক্স দুই চোখ আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরাজী বইয়ের উপর, ভবিষ্যতে তার এক পা নামাতে হবে বাঙলার মাটীতে; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের এক চোখ রাখতে হবে প্রভুদের উপর, আর এক নজর দিতে হবে দাসেদের উপর। এ ভঙ্গীটি সুদৃশ্যও নয়, সহজসাধ্যও নয়। উপরন্তু অবস্থাটা

হবে টলমলায়মান। কিন্তু উপায় কি? দু-ইয়ারকি সামলানো ইয়ারকির কথা নয়। কথার রাজ্যথেকে একধাপ নেমে আমাদের কাজের রাজ্যে আসতেই হবে। এ কাজের জন্য নূতন দলের দরকার।

(৪)

অতঃপর ধরে নেওয়া যাক্, যে এদেশে ডিমোক্রাসির গোড়াপত্তন হয়েছে। আর ডিমোক্রাসির অর্থ যে, Sovereignty of the people, এ তথ্য কংগ্রেস সেদিন মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসাধারণের কাছে ইংরাজি ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এখন দেখা যাক্ people শব্দের অর্থ কি। কোনো দেশের সকল লোক মিলে কখনো একটা people হতে পারে না, এক ভাষায় ছাড়া; কেননা শিক্ষা দীক্ষা অর্থ সামর্থ্যের প্রভেদ অনুসারে একটা জাতি নানা জাতিতে বিভক্ত। এবং এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও এক নয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির পথও এক নয়, বরং অনেক স্থলে এদের ভিতর একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী। এই কারণে ডিমোক্রাসির দৌলতে যে রাজশক্তি people-এর হাতে আসে তাও বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর কালক্রমে এই বিভিন্ন অংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশেও আজ না হোক্ কাল তা হবে, যেহেতু তা হতে বাধ্য। সুতরাং এই হস্তান্তরিত রাজশক্তি কোন্ শ্রেণীর ভাগে কতটা পড়ল সেইটি জানতে পারলেই জানতে পারা যায় যে, এই Sovereignty কোথায় গিয়ে মজুত হল।

সকলেই জানেন, এ তন্ত্রে ভোটশক্তিই রাজশক্তি। এই রিফরমের প্রসাদে আমাদের demos, অর্থাৎ—চাষাভুষো রাতারাতি কম করেও তের চৌদ্দ লাখ ভোটের মালিক হয়ে উঠেছে আর বাদবাকী আমাদের

সবার কপালে লাখ কতকের বেশি জোটে নি, তাও আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে।

ফলে দাঁড়াল এই যে, বাঙলার প্রজা অতঃপর হল বাঙলার রাজা।

এর উত্তরে অনেকে বলবেন, দানের রিফরমে জনগণ ত একদম পুরো রাজত্ব পেলে না, পেলে শুধু স্বরাজের শিক্ষানবিশী করবার অধিকার। তথাস্তু। তাহলে প্রজাবাহাদুর যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন একথা অস্বীকার করবার আর যো নেই। অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ-পলিটিক্সের কাজ হবে এই যুবরাজের মোসাহেবি করা। যাঁরা মনে করছেন যে তাঁরা এ ক্ষেত্রে উক্ত রাজা হবুচন্দ্রের মোসাহেবি না করে তাঁর উপর সাহেবি করবেন তাঁদের ভুল দু দিনেই ভাঙ্গবে। আমরা যা করব সে হচ্ছে এই—আমরা সবাই আমাদের হবুরাজকে বলব, lend me your ears. কেউ বা সে কান চেপে ধরবার জন্যে, কেউ বা তাতে মন্ত্র দেবার জন্যে। দু'জনেরই উদ্দেশ্য হবে এক। কান টানলে মাথা আসে, সুতরাং প্রজার কর্ণধার হয়ে তার মাথাকে ভোট আফিসে টেনে নিয়ে যাওয়াই উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়। প্রভেদ যা, তা উপায়ে। কেউ বা স্বকার্য্য উদ্ধার করতে চাইবেন অর্থ বলে, কেউ বা বাক্য বলে। এ অবস্থাতেও আমাদের পলিটিক্সে আবার দু-দল হবে। তবে মোটামুটি ধরতে গেলে একদল প্রজারাজকে গালাগালী করবার জন্যে প্রস্তুত হবেন আর একদল প্রজারাজের সঙ্গে গলাগলি করবার জন্যে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এ দু'দলেরও পরমায়ু এক ইলেকসান পেরুবে কি না সন্দেহ। এই দু-দলের টানাটানিতে ও চেঁচাচেঁচিতে হবুরাজ যখন চোখ রগড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন তখন এ দু-দল ভেঙ্গে আবার দুটি নতুন দলের সৃষ্টি হবে।

যখন জনগণের তাড়নায় পলিটিক্সের তাস আবার নতুন করে ভাঁজা হবে তখন কালো লাল সব সাহেবগুলো এক দিকে জড় হবে আর কালো গোলাম আর এক দিকে, বলা বাহুল্য লাল গোলাম এদেশে নেই, সব সাহেব আর টেক্কা ?—যে মারতে পারে সেই হবে। বিবির কথা উল্লেখ করলুম না এই জন্যে যে, আমাদের পলিটিক্সের নতুন জুয়ো-খেলায় লাল কালো নির্ব্বিচারে বিবি বাদ দেওয়া হয়েছে। গত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু এর জন্য মনের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর সহাশ্রুপাতী। এঁদের Communal representation না দেবার কোনোরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। যে সব কারণে নানা সম্প্রদায়কে বিভিন্ন representation দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সে সকল কারণ একাধারে বর্ত্তমান। প্রথমত স্ত্রীজাতি যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র জাতি, সে জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালাদেরও আছে। এ জাতিভেদ স্বয়ং ভগবানের হাতে তৈরি। এরা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র চিরস্থায়ী separate community, এবং অন্তত ভারতবর্ষে খাঁটি community. এদেশে পুরুষ যথার্থ পুরুষ না হলেও মেয়ে যে যথার্থ মেয়ে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত এরা অশিক্ষিত। তৃতীয়ত যদিচ এরা দ্বিজমাত্রকেই জন্ম দেয় তবু নিজেরা দ্বিজ হতে পারে না, এরা সব শূদ্র। চতুর্থত এরা অস্পৃশ্য না হলেও Depressed class. পঞ্চমত এরা লাটসভার গৃহসজ্জারূপে যে যে পরিমাণ সে সভার শোভাবৃদ্ধি করতে পারত অপর কোনও জরিজরাবতপরা পশুগধারী সম্প্রদায় তার সিকির সিকিও পারবে না। তারপর এদের সঙ্গে আমাদের entente cordiale বহুকালথেকে রয়েছে এবং

কস্মিনকালেও যাবে না। আর এককথা, এঁরা লাট সভায় বসলে গভর্ণমেণ্টকে minister নির্ব্বাচনের জন্য আর ভাবতে হত না। স্ত্রী-মন্ত্রীকে কেউ ঘাঁটাতো না। ও শাসনে আমরা অভ্যস্ত Home Member হবার জন্য ত এঁদের প্রত্যেকেই সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু যেহেতু উক্ত মন্ত্রীপদ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রেখেছেন তখন হস্তান্তরিত বিষয়কটির মধ্যে একটির minister ত ভারতরমণীকে অনায়াসে করা যায়, অর্থাৎ—Educational Member! সুতরাং এত গুণ সত্ত্বেও এরা যে সাম্প্রদায়িক ভোট পেলে না, এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই। তবে কংগ্রেসের দল ভরসা দিয়েছেন যে আমাদের যে-সব দাবী এ ফেরা গ্রাহ্য হয় নি, অতঃপর সে সবের জন্য তাঁরা তুমুল আন্দোলন করবেন। আন্দোলনটা প্রধানত অবশ্য এই স্ত্রী-ভোটের জন্যই করা হবে তাহলে তাঁরাও এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারবেন। তখন আমাদের রাজনৈতিক দোল হয়ে উঠবে ঝুলন। এর চাইতে উল্লাসের কথা আর কি আছে ?

সে যাই হোক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতঃপর একটি বৈশ্যের দল আর একটি শূদ্রের দলের সৃষ্টি হবে। এবং এই দুটি দলের মধ্যস্থতা করবার জন্য প্রয়োজন হবে আর একটি ব্রাহ্মণ দলের, যারা এই পরস্পর বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য করে প্রজাশক্তিকে যথার্থই রাজশক্তি করে তুলতে চেষ্টা করবে।

(৫)

রাষ্ট্রের মূল শক্তিই যে প্রজাশক্তি, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা যে রাজ্যে অধিকাংশ লোক দেহে মনে ও চরিত্রে দুর্ব্বল, সে দেশে

স্বদেশী রাজশক্তি বলে কোন পদার্থ থাকতেই পারে না, সে দেশে সে শক্তি বিদেশী হতে বাধ্য এবং এযুগে সেই বিদেশের যে বিদেশে প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত, পুঞ্জীভূত ও প্রবল।

এখন দেখা যাক আমাদের হবুরাজের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি।—

প্রথম দফা—আজকের দিনে হবুরাজের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। তিনি নিরন্ন বলে আমাদের চাইতে যে তাঁর ক্ষিধে কম, মোটেই তা নয়। মেয়েরা বলে ছোট ছেলেরা বড়দের তুলনায় হাতে ছোটবড় হলেও পেটে এক। কথাটা ঠিক কি না জানি নে, কিন্তু এটি ধ্রুব সত্য যে ছোটলোকেরা বড়লোকদের তুলনায় পদে ছোটবড় হলেও পেটে এক। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে সব প্রথমে সে খেতে চাইবে এবং তার জন্য যথেষ্ট অন্নের ব্যবস্থা করতেই হবে, কেননা মুখের কথায় কারও পেট ভরে না, হোক না সে কথা যেমন বিশাল তেমনি রসাল, যেমন প্রচুর তেমনি মধুর। সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও এদের রসদের সুব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা অন্নই হচ্ছে প্রাণ।

দ্বিতীয় দফা—হবুরাজের জন্য বস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতে হবে। পলিটিসিয়ানদের মতে আমাদের এই গরমের দেশে বেশি কাপড়ের দরকার নেই, কথাটা ঠিক; কিন্তু বেশি না হোক কিছু কাপড় চাই ত, নেংটি কখনো রাজবেশ হতে পারে না! যাতে লজ্জা নিবারণ হয় না তার সাহায্যে রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় কি করে? তা ছাড়া মন্ত্রী গবুচন্দ্র যখন জামাজোড়া পরে বরবেশ ধারণ করবেন তখন রাজা হবুচন্দ্র ডোরকৌপীন ধারণ করতে আদপেই রাজী হবেন না।

আত্মসম্মান জ্ঞানও হচ্ছে মানবের একটি সামাজিক শক্তি—এবং উক্ত জ্ঞান প্রধানত বস্ত্রজ।

তৃতীয় দফা—হবুরাজের পেটে ভাত না থাকলেও পিলে আছে। এবং সেপিলে অতি প্রবৃদ্ধ, মাপে প্রায় পেটি য়টদের হৃদয়ের তুল্যমূল্য। কিন্তু পিলেতে পেট মোটা হলে হাত পা সব সরু হয়ে আসে। তারপর পিলের আর এক দোষ এই যে, যে কেউ যখনতখন তাকে চমকে দিতে পারে। সুতরাং হবুরাজকে যদি মানুষ করে তুলতে হয় তাহলে তার উদরস্থ অতিস্ফীত প্লিহাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই, পরিষ্কার জল, খোলা হাওয়া, ডাক্তার এবং ওষুধ। যে-দেহে স্বাস্থ্য নেই, সে-দেহে ও সে-মনে যে শক্তি নেই, এর প্রমাণ ত আমরা হাড়ে হাড়ে পাই।

চতুর্থ দফা—হবুরাজ এখন একদম নিরক্ষর। পলিটিসিয়ানরা বলবেন যে রাজা বাহাদুরের পেটে বিদ্যে না থাক্ মাথায় বুদ্ধি আছে। এ কথার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। বিদ্যাবুদ্ধি অবশ্য এক বস্তু নয়। বুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে বিদ্যের পরিচয় যে লোকে দিতে পারে, তার পরিচয় ত এদেশের আইন-আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যে ও সংবাদ পত্রে নিত্যনিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু জাতির এ অবস্থা ত আর চিরদিন থাকবে না। একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে, আর একদিকে তেমনি আমাদের জনগণকে কিঞ্চিৎ বিদ্যাচর্চ্চাও করতে হবে। বিদ্যাবুদ্ধি এক বস্তু না হলেও ও-দুয়ের যোগাযোগ না হলে দু-ই ব্যর্থ হয়। জ্ঞানও হচ্ছে একটি শক্তি এবং সমগ্র জাতির অন্তরে সে শক্তির সৃষ্টি করতে হবে। অপর কোনও কারণে না হোক, স্বজাতির আত্মরক্ষার জন্যও হবুরাজকে

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানো দরকার। রাজা মুর্খ হলে এত খামখেয়ালি হন যে রাজ্যের দিনে দুবার ওলটপালট হয়।

অতএব অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, এই নালায়েক হবুরাজের আজকে আমরা উছি হয়েছি, তাঁর শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার বৃটিশরাজ আমাদের হস্তে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁর ভরণপোষণ অশনবসনের ব্যবস্থা করা। তেল-নুন-লকড়ির সংস্থান সবারই চাই এবং অধিকাংশ লোকের ও-ছাড়া আর কিছুই চাই নে। মানুষ যদি বেঁচে না থাকে ত বড় হবে কি করে? আর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যা সত্য, জাতিবিশেষের পক্ষেও তাই সত্য। একটা জাতি কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি বই ত আর কিছুই নয়। এখন ভেবে দেখুন ত এই রিফরম আমাদের ঘাড়ে কি বিরাট কর্ত্তব্যের ভার চাপিয়েছে।

সত্য কথা বলতে গেলে এ কর্ত্তব্য সম্যকরূপে পালন করবার শক্তি আমাদের একরকম নেই বল্লেই হয়। প্রথমত বাক্‌পটুতা ও কর্ম্মকৌশল এক বিদ্যে নয়। যার ধড়ে এর প্রথম গুণ আছে তার ধড়ে দ্বিতীয়টি না থাকতেও পারে এবং না থাকবারই বেশি সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত দেশের লোকের মনের ও দেহের খোরাক জোগানের পক্ষে দেশের অবস্থা প্রতিকূল। কেন কি বৃত্তান্ত তা বোঝাতে হলে রাজনীতি ছেড়ে আমাকে অর্থনীতির বিচার সুরু করতে হবে। সে আলোচনা আমার অধিকার বহির্ভূত। তবে পলিটিসিয়ানরা সে আলোচনা নিশ্চয়ই তুলবেন, কেন না সকল বিষয়েই তাঁদের সমান নৈসর্গিক অধিকার আছে! আমি আন্দাজ করছি যে আমাদের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে মুখ খুলবেন তখন দেখা যাবে যে তাঁদের

মুখ দিয়ে উদ্গীর্ণ হচ্ছে ছেরেফ্ ধূম। এত হবারই কথা, তাঁদের অন্তর যে বহ্নিমান সে কথা তাঁরাই বলেন। পলিটিক্সের সে ধূম পান করে দেশের লোকের মাথা ঘুরে যাবে। ও ধূমপানে বেচারারা ত আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। কাজেই তারা নেশার খেয়ালে হাতি ঘোড়া কিনবে কিন্তু "যো হাতি মোলেগা ওত তুরন্ত চলা যায়েগা।" তার পর? এস্থলে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে বাঙালী পলিটিসিয়ানদের ইকনমিক্সের মূলসূত্র হবে ইকনমি, অর্থাৎ—ন্যাকামি।

স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করবার জ্ঞান ও শক্তি আমাদের দেহে আজ না থাকলেও কাল তা সঞ্চয় করা কঠিন হবে না। কিন্তু তার জন্য চাই উক্ত কর্ত্তব্য পালন করবার আন্তরিক প্রবৃত্তি, যা ভদ্র সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিতরে আজ যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আমাদের সমাজ আমাদের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দেহে যে মন গড়ে তুলেছে সে মন সমাজকে গণতান্ত্রিক করে তোলবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে মনের এ বিষয়ে প্রতিকূলতা অনেকটা কমে এসেছে বটে কিন্তু তাই বলে তাকে আজও নীচুকে উঁচু করবার অনুকূল করে নি। একথা যে সত্য তার পরিচয় ইংরাজি আইডিয়ার আবরণ ভেদ করে নিজের নিজের মনের দিকে তাকালে ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাত্রই অবিলম্বে পাবেন।

সুতরাং আমরা যদি সত্য সত্যই স্বজাতিকে স্বরাট করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার জন্য চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্কার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা। কিন্তু এ পরামর্শ দেওয়া যত

সহজ, নেওয়া তত সহজ নয়। যে সকল ভাব যুগযুগের দাসত্বের আওতায় আমাদের মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত শিকড় নামিয়াছে এক দিনে সেই আগাছাগুলিকে সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলবার জন্য যে পরিমাণ মনের সাহস ও শক্তি চাই তা আমাদের নেই। অথচ আমরা যদি জাতকে জাত মানুষের মত মানুষ হতে চাই তাহলে এ অসাধ্য সাধন আমাদের করতেই হবে। আর এই মন বদলাবার ভার পড়বে বিশেষ করে সাহিত্যের হাতে, সুতরাং সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিক্সের মোক্তার হয়ে ওঠেন, সাহিত্য যদি পলিটিক্সে লীন হয় তাহলে দেশ আজ যে তিমিরে আছে কালও সেই তিমিরেই থাকবে। অতএব নবীন সাহিত্যিকদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা মনোজগতের চতুষ্পদদের উপর তীর চালান, হোক না তাঁদের পদগৌরব যত বেশি, আর যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা ধ্যানবলে মায়ের সর্ব্বললামভূতা যৌবনাঢ্যা অপাপবিদ্ধা অনবদ্যাঙ্গী মানসীমূর্ত্তি গড়ে তুলুন যে আদর্শমনশ্চক্ষুর সুমুখে দেশের কর্ম্মীর দল ভারত-সভ্যতার সেই জাগ্রতপ্রতিমা গড়ে তুলবে—বিশ্বমানব যা পূজা করতে প্রস্তুত হবে।

আমি কিন্তু এখন চললুম সাহিত্য ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ দিতে, তবে যদি কোন পলিটিক্সের স্কুলে, বয়েস বেশি হয়ে গিয়েছে বলে আমাকে ভর্ত্তি না করে, তাহলে যেখানে ছিলুম সেখানেই আবার ফিরে আসব, অর্থাৎ—সাহিত্য ও পলিটিক্সের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

বীরবল।

টীকা ও টিপ্পনী।

দ্বিজেন্দ্রলাল একবার বড় দুঃখে বলেছিলেন "বলিত হাসব না" ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর সে দুঃখের কথা শুনে দেশসুদ্ধ লোক হেসেছিলেন। কিন্তু যে-কেউ কখনো হাস্যবর্জ্জন করবার জন্য স্থিরসংকল্প হয়েছেন তিনিই জানেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের দুঃখ কতদূর মর্ম্মান্তিক। দেশের লোক আমাদের কিছুতেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট দিয়ে থাকতে দেবে না। তারা থেকে থেকেই এমন কথা বলবে, এমনি অঙ্গভঙ্গী করবে যাতে করে আমরা দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হব।

দেশের এই ছোটবড় লাট দরবারগুলোতে থেকে থেকেই যে সব প্রহসনের অভিনয় হয় তা দেখে যিনি হাস্যসম্বরণ করতে পারেন তিনি হয় মুক্তপুরুষ, নয় জড় পদার্থ।

এই দেখনা সেদিন সেখানে কি কাণ্ড ঘটল। বড়লাটের রাজপাট কোথায় বসানো হবে তাই নিয়ে সেদিন সেখানে তুমুল আলোচনা, জোর ও ঘোর তর্ক হয়ে গেছে।

প্রস্তাব ছিল দুটি।—

প্রথম—লাটপাট যেখানে হোক এক জায়গায় গাড়া উচিত। ডেরাডাণ্ডা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানটা বে-সরকারী মেম্বরদের মতে যেমন অর্থহীন তেমনি অর্থসাপেক্ষ। রাজার পক্ষে সন্ন্যাসীর

আচরণ এদেশে শোভা পায় না—কেননা এর একজন হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রস্থল আর একজন তার বাইরে।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহাবক্তৃতা করেছিলেন কিন্তু সরকারী জবাব হ'ল—যখন রাজাসন বাঙলার মাটী থেকে তোলা হয়েছে তখন permanent settlement-এ সরকার আর রাজি নন।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে, যাঁরা এ প্রস্তাবের পক্ষে মহা ওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিপক্ষে ভোট দিলেন।

এ ব্যাপার দেখে যাঁর চোখে জল আসে তাঁর আসুক আমার কিন্তু বেজায় হাসি পায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—রাজধানী যেখানে ছিল সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক, অর্থাৎ—কলিকাতায়। দিল্লির আব-হাওয়া নাকি শুধু শরীরের পক্ষে নয়, মনের পক্ষেও মারাত্মক। অপর পক্ষে কলিকাতা সহরে ম্যালেরিয়া নেই আর যদিও থাকে ত বস্তিতেই আছে—বড়লোকের ঘরে তা বড় একটা ঢুকতে পারে না আর সাহেবলোকের ঘরে মোটেই পারে না। তারপর মনের আব-হাওয়া এ সহরে যতটা চাঙ্গাকর, ইংরেজীতে যাকে বলে bracing, ভারতবর্ষের অপর কোথাও তত্তুল্য নয়। বোম্বাই সহরে হাওয়ার ভিতর কলের ধোঁয়া ঢুকেছে, দিল্লিতে কবরের ধূলো আর মাদ্রাজের মনোবায়ুর মধ্যে অক্সিজেন নেই।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহা মহা বক্তৃতা করলেন। এর উত্তরে সরকারী জবাব হল, "তোমরা যা বলেছ সে সবই ঠিক, বিশেষত ঐ মানসিক জলবায়ুর কথা। কলিকাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর থেকে দূরে থাকায় সরকার কি বিরহ বেদনা সহ্য করছেন তা সরকারই

জানেন, তবে কি না গতস্য শোচনা নাস্তি। বড় লাট যখন কলিকাতাকে একবার তালাক দিয়েছেন তখন তাকে আবার নিকে করা অসম্ভব, বিশেষত যখন তার খরচা বেজায়।"

এ জবাবের নির্গলিতার্থ পুনর্মূষিক হতে কোন সিংহই রাজি হয় না, উপব্রিটিশ সিংহও নয়।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল, যাঁরা এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে মহাওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। লাটসভায় আমরা মুখ খুলি এক দিকে আর একদিকে হাত তুলি। এ ব্যবহার দেখে যাঁর কাঁদতে ইচ্ছে যায় তিনি কাঁদুন, আমি কিন্তু না হেসে থাকতে পারি নে।

(২)

লাটসভা দিল্লিতেই বসুক আর ফতেপুর শিকরীতেই বসুক তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, কেননা সে সভায় আমি কখনো বসব না। এ ত আর আকবর বাদশার দরবার নয় যে বীরবল সেখানে উচ্চাসন পাবে? কিন্তু লাটপাট কলিকাতায় কায়েম হলে একটি কারণে খুসি হতুম।—

লাটদরবারে দেশী মেম্বরেরা নানারূপ সেজেগুজে যে নানা ছাঁদে অভিনয় করেন তাতে আমার কোনই দুঃখ নেই কিন্তু দুঃখ এই যে বাঙলার যত এরণ্ড দিল্লির মরুভূমিতে সব দ্রুমায়তে।

আজ দুদিন হয় নি, পাটেল বিলের বিচারস্থলে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও হাটখোলার শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, বাঙলা দেশে nobody who is any body

পাটেলবিলের স্বপক্ষে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে লাট-দরবার কলিকাতায় বসলে উক্ত দরবারীযুগল এ হেন উচ্চভাষ কখনই করতে পারতেন না, কেন না এ সত্য তাঁদের কাছে কিছুতেই অবিদিত থাকতে পারে না যে, বাঙলার সুবুদ্ধি তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতো।

তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নন্দী-রায় কোম্পানি লাটসভায় যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া সুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব। আমরা কেউ বলতে পারি নে আজকের দিনে বাঙলায় somebody কে? কেননা somebody-ত্ব যে কিসের উপর নির্ভর করে, শিক্ষা-দীক্ষার উপর না বংশাবলীর উপর, জাতির উপর না গুণের উপর, বাক্‌পটুতার উপর না কর্ম্মশঠতার উপর, টাকা ধার দেওয়া না নেওয়ার সামর্থ্যের উপর, টিকির উপর না টেড়ির উপর? এ সব প্রশ্নের জবাব আমরা কেউ করতে পারি নে। অতএব আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অদ্য তারিখে nobody is anybody.

অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই রাম শ্যাম যদু হরি প্রত্যেকেই somebody হয়ে উঠেছেন। যাঁর বিদ্যে নেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের দলভুক্ত হচ্ছেন, যিনি কোন ভাষাই জানেন না তিনি সকল ভাষাতেই বক্তৃতা করছেন, যাঁর রোকড়খতিয়ান ব্যতীত অপর কোনও বইয়ের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তিনি সাহিত্যের সমালোচনা করছেন, শূদ্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে, নবশাখ ব্রাহ্মণ সমাজের গোষ্ঠিপতি হয়ে উঠছে। অতএব একথাও আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অদ্যতারিখে everybody is somebody.

এই প্রমাণ যে ইংরাজি শিখেও ইংরাজি শাসনের ফলে হিন্দুসমাজ একদম ভেস্তে গেছে, শাস্ত্রসঙ্গত ও আচারগত উচ্চনীচের অধিকার ভেদ কার্য্যত কেউ মানে না ও কেউ কাউকে মানাতে পারে না। যে জাতিভেদ প্রথা সমাজে ঢিলে হয়ে গেছে সেই প্রথা আইনে কশে রাখবার বিরুদ্ধে পাটেলবিল হচ্ছে একটি প্রতিবাদ মাত্র। অতএব উক্ত বিলের বিপক্ষতাচরণ করা সমাজে প্রোমোশন প্রাপ্ত somebody-দের পক্ষে শোভা পায় না। তবে সংসারের নিয়মই এই যে, যার পক্ষে যা শোভা পায় না তাই করতে সে চির উদ্যত। এ ব্যাপারের একটি বিলেতি নজির দেখাচ্ছি। বেশি দিনের কথা নয় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকে গির্জ্জেয় গিয়ে ভগবানের কাছে যে এই প্রার্থনা করত—

"God bless the squire and his relations
And keep us in our proper stations"—

এ কথা ইংলণ্ডের লোক আজ বিশ্বাসই করতে পারে না। সুতরাং আশা করা যায় যে Squire-এর জায়গায় ব্রাহ্মণ বসিয়ে আজ অব্রাহ্মণেরা ইংরাজরাজের কাছে যে ঐ স্তবই পাঠ করছেন, ভবিষ্যতে বাঙালী সে কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না, অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে এ দেশের যদি কিছু থাকে। ইতিমধ্যে আমরা একটু হেসে নিই।

(৩)

আমাদের শিক্ষিত সমাজে হরেক রকমের অদ্ভুত জীব আছে কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত হচ্ছে টিকিওয়ালা ডিমোক্রাট। লোক হাসাতে এঁরা অদ্বিতীয়। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ নেওয়া যাক। সেদিনকের লাটদরবারে সবাইকে অবাক্ করেছেন M. R.

Ry.রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। উক্ত ইংরেজি অক্ষর ক'টি সাটে কি বলতে চায় জানি নে। আমার একটি সঙ্কেতজ্ঞ বন্ধু বলেন, "ওর অর্থ Madras Rohilkhund Railway." এ ব্যাখ্যা আমি গ্রাহ্য করি। ভৌগোলিক হিসেবে উক্ত দুই প্রদেশের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও যোগাযোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক হিসেবে আছে। রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকেই কিস্কিন্ধাতে গিয়েছিলেন এবং সেইসূত্রে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের যে মিলন হয় সেই মিলনের ফল হচ্ছে দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ—তাই দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মাথায় M. R. Ry. ছাপ মারা থাকে।

উপরোক্ত রঙ্গস্বামী একজন দুর্দ্ধর্ষ extremist. রাজনীতির ক্ষেত্রে লিবাড়াটি ইকোয়াড়িটি ও ফেড়াটাড়নীটি এই কথা ক'টি ইনি এবং এঁর দলবল এমনি তারস্বরে ঘোষণা করেন যে তা শুনলে ভুলে যেতে হয় যে এ দেশটা ভারতবর্ষ আর এ কালটা বিংশ শতাব্দী। মনে হয় আমরা সশরীরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের প্যারি নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অথচ এঁরা পাটেল বিলের যখন নাম শোনেন তখন "গেল ধর্ম্ম" "গেল সমাজ" বলে সমান তারস্বরে ত্রাহি পবননন্দন বলে চীৎকার করতে সুরু করেন। তখন এঁদের উচ্চবাচ্য শুনে মনে হয় যে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ দুঃখ করে বলেছেন যে এই পরস্পর বিরোধী মতামত কি করে এক অন্তরে বাস করতে পারে তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। দ্রাবিড়লজিকের খেঁই সিংহ মহাশয় যে ধরতে পারেন না এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা তিনি উত্তরাপথের লোক। দক্ষিণাপথ যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করে তখন সে

মূর্ত্তি দেখে আমাদের চমকে ওঠবারই কথা। তবে দ্রাবিড়ব্রাহ্মণেরা কেন যে উল্টোপাল্টা কথা বলেন, সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে ইংরেজি বচন কেন যে মেলাতে পারেন না তার কারণ ও-দুই হচ্ছে তাঁদের মুখস্থ বুলি, ওর একটিও তাঁদের নিজস্ব ভাষা নয়। তা ছাড়া তাঁদের ভাষার সঙ্গে, কি আমাদের কি ইংরাজের ভাষার কোনই সম্পর্ক নেই, কেননা এ দুটিই হচ্ছে আর্য্য ভাষা এবং তামিল অনার্য্য। তাই ইংরেজি তাঁদের মনে ঢোকে না, ঠোঁটের উপরই থেকে যায়, আর সংস্কৃতও তাঁদের মনে ঢোকে না, কর্ণারূঢ় হয়ে তাঁদেরকে যন্ত্রবৎ চালায়। এঁদের কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যখন এঁরা তামিল বলেন। আজকের দিনে দ্রাবিড়শূদ্ররা কি বলছে সে কথা কি কারো বুঝতে বাকী আছে? দ্রাবিড়ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে দ্রাবিড়শূদ্রের এই বিদ্রোহের কারণ, দক্ষিণাপথের শূদ্রেরা জানে যে তারা শূদ্র, সে দেশের ব্রাহ্মণেরা সে দেশের অব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে দেয় নি। সুধু তাই নয়, দ্রাবিড়ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে আস্কারা পেয়ে আমরা তাঁদের অনুরূপ শূদ্রপীড়ন করিনে বলে আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও তামিল শূদ্রের সামিল করেছেন। এস্থলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি নে।

আজ বছর দেড়েক আগে বড়লাটের দরবারের জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মেম্বর একদিন বাঙলার জনকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে 'ল-ড়য়োর ভেদাত্মক' ইংরাজি ভাষায় ঘোর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি একজন দুরন্ত ডিমোক্রাট, তাই বেচারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই যে তাদের অন্তরে ডিমোক্রাটিক মনোভাব মোটেই জন্মায় নি। মানুষে মানুষে যে কোনই প্রভেদ নেই, সবাই যে সমান

স্বাধীন, সবাই যে সমান প্রধান, এই সত্য সকলের মনে বসিয়ে দেবার জন্য তিনি "ভাড়াটেয়াড়" কি বলেছেন "ড়ববসোপিয়েড়" কি বলেছেন সেই সব কথা অনর্গল আউড়ে যাচ্ছিলেন। বকতে বকতে তাঁর জল-পিপাসা পেল, জল এল কিন্তু তা পান করবার সময় তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে নববধূর মত অবগুণ্ঠনবতী হলেন। কেন জানেন?—পাছে বাঙালী ব্রাহ্মণের অনার্য্য দৃষ্টিপাতে তাঁর পানীয় জল অপেয় হয়ে ওঠে! তিনি তাঁর পিপাসা নিবারণ করে ঠাণ্ডা হবার পর আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হলুম, "মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে"। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি প্রমাণ"? আমি উত্তর করলুম, "প্রমাণ ত সুমুখেই রয়েছে। আপনাতে আমাতে প্রভেদ বিস্তর। ও ঘোমটা আমি কখনই দিতে পারতুম না, কেননা ওরূপ ঘোমটা দেওয়ায় ভদ্রসমাজে আভিজাত্যের নয় নির্লজ্জতার পরিচয় দেওয়া হয়।" বলাবাহুল্য এর পর আমাদের আলোচনা আর এগুলো না, রুশো দাঁতোঁর মতামতের মাদ্রাজিভাষ্য শোনবার সুযোগে আমরা বঞ্চিত হলুম।

(৪)

এস্থলে আমার একটি নিবেদন আছে। একথা যদি সত্য হয় যে ভবিষ্যৎ অতীতের জের টেনে চলে, তাহলে ভারতবর্ষের নব-সভ্যতা উত্তরাপথের লোকদেরই গড়ে তুলতে হবে, এ দায় আমাদের পৈতৃক, ধর্ম্ম বলো, নীতি বলো, জ্ঞান বলো, বিজ্ঞান বলো, কাব্য বলো, দর্শন বলো, রাষ্ট্র বলো, সমাজ বলো সেকালে সবই বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তর ভূভাগেই জন্মলাভ করেছে অতএব ভবিষ্যতেও করবে। ইংরাজির সঙ্গে সংস্কৃত আমরাই মেলাতে পারব, কেননা

ও-দুই হচ্ছে আর্য্যভাষা, অর্থাৎ—ও-দুই হচ্ছে আর্য্যমনের শব্দদেহ। আমরা যদি ভারতবর্ষের নব সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি তাহলে দক্ষিণাপথ সে সভ্যতার দেদার টীকাভাষ্য লিখবে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি।

কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দ্রাবিড় জাতির উপর কোনরূপ কটাক্ষপাত করছি। দ্রাবিড় সভ্যতা আমার কাছে অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অজ্ঞেয়, সুতরাং তার দোষগুণ বিচার করতে আমি অপারগ। কিন্তু আমার কাছে যা অজ্ঞেয় নয় অবজ্ঞেয়, সে হচ্ছে মাদ্রাজি আর্য্যামি। মাদ্রাজি শূদ্রদের আমি যেমন ভক্তি করি তেমনি ভয়ও করি। দেখতে পাচ্ছি তারা যেখানে আছে সেখানে আর থাকতে রাজি নয়, তারা উঠতে চায় একলম্ফে একেবারে লাট-দরবারে। অতএব আশা করা যায় যে, রিফরম দরবারে মাদ্রাজের মনের খাঁটি কথা পাওয়া যাবে। আর খাঁটি কথাকে আমি চিরকালই ভক্তি করি।

তবে ভয়ের কথা এই যে উচ্চপদস্থ হলে মানুষের মেজাজ উঁচু হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে আর্য্যত্ব মানুষের রক্তে নেই—আছে তার পদে ও মস্তিষ্কে। দ্রাবিড় শূদ্র ও depressed class যখন লাটসভায় ঢুকবে তখন তারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে যাবে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণের ছোঁয়াচ লেগে তারা খুব সম্ভবত ভীষণ আর্য্যামিগ্রস্থ হয়ে উঠবে। তারপর পাটেল বিলের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করবে! তাদের ভবিষ্যৎ বক্তৃতার কথা সব আজ আমার কানে আসছে। আমি দিব্যকর্ণে শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের যত অস্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধিরা সমবেত সমস্বরে ও তারস্বরে বলছেন—

"আমাদের আর্য্য পিতামহরা যে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেছেন, যে বর্ণাশ্রম-প্রথার তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সমাজ যাবে, ধর্ম্ম যাবে, হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, তারপর পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, আর আমাদের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতা আধিভৌতিক হয়ে পড়বে।"

এহেন বক্তৃতা শুনে যিনি হাসি চাপতে পারেন—তিনি নিশ্চয়ই একজন somebody—আমি পারি নে কেননা আমি হচ্ছি nobody.

বীরবল।